সু দী প্ত চ ট্টো পা ধ্যা য়

সমসাময়িক কাশ্মীরের কবিতায় সংঘাত ও উত্তরণ

'আমার দৃষ্টি এখন নিথর, এ এক অদ্ভুত উন্মাদনা....'। কাশ্মীরী কবি জারিফ আহমেদ জারিফ যখন তরুণ তাঁর কবিতা 'ল্যামেন্টস অ্যাট বুলেট' এ লিখলেন এই কথা। বুলেট এখানে কোনো ধাতব হত্যার সামগ্রী নয়। সে নিজেই একটা প্রতিবাদের ভাষা তৈরী করেছে। এথার জিয়ার জন্ম কাশ্মীরে। কিন্তু তিনি আমেরিকায় নৃতত্ত্ববিদ্যার অধ্যাপক। তিনি বলেছিলেন এই উপত্যকায় সব কবিই বিচ্ছেদ, স্মৃতি আর উন্মাদের সংলাপ লেখে। শব্দ এখানে প্রবাহিত হয় যন্ত্রণা, হতাশা, খিদে, রক্ত আর পোড়া গাছের শরীর জুড়ে।

প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের কবিতার যে ইতিহাস, কাশ্মীরে তা বহুদিন ধরে তৈরী হয়েছে। শেইখ উল আলিম থেকে হাব্বা খাতুন অথবা সামাদ মির থেকে রাসুল মির সবার লেখাতেই এই প্রতিরোধ উঠে এসেছে। কবি ও শিক্ষাবিদ হুজাইফা পণ্ডিত বলেছিলেন—নয়ের দশক থেকে গান ও কবিতার একটা স্বতন্ত্র ধারা তৈরী হল কাশ্মীরে, যেখানে সেই সব মা ও বোনদের হতাশা ও দুঃখের কথা বলা হল যাদের ছেলে বা ভাই সীমান্ত সংঘর্ষে মারা যাচ্ছে। আগা শাহিদের রচনা 'যে দেশে কোনো ডাকঘর নেই' (এ কানট্রি উইদাউট পোস্টঅফিস) এই ভাবনার একটা নতুন দিগন্ত তৈরী করলো। ২০০৮ এর পর থেকে সোশ্যাল মিডিয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলো যেখানে কাশ্মীরী মুসলিম এবং কাশ্মীরী পণ্ডিতরা তাঁদের যন্ত্রণার কথা বলতে শুরু করলেন।

কবিতা হয়ে উঠলো যন্ত্রণার ব্যারোমিটার। যুদ্ধ এখানে দীর্ঘায়িত সীমান্ত থেকে বাড়ীর অলিন্দ পর্যন্ত। প্রতিদিনের ব্যবহারে জিনিষও যেন রূপক। কাজ, পেশা, জীবনচর্যা-সব গতানুগতিক বাস্তবের মধ্যেই একটা প্রতিরাধ গড়ে উঠছে কোথাও। মিরজা ওয়াহিদ তাঁর বই 'দ্য কোলাবোরেটর' এ লিখলেন '...আমি প্রথাগতভাবে কবি নই। আমি যা মনে আসে তাই লিখি কাগজে। সুচতুর ভাবে শব্দবিন্যাস করি না। আমি কবিতাকে শুধু একটা শিল্প ভাবিনা। কবিতা আমার কাছে একটা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস, দাঁত মাজা, স্নান করার মতোই। আমি ক্ষতের মতো কবিতাকে হাতে নিই, তাকে চারদিক থেকে দেখি, বহুমাত্রিক দৃষ্টিতে। একটা রাজনৈতিক ক্ষতকে বোঝার জন্য যে কবিতা হাতিয়ার হয়ে ওঠে সেও এভাবেই স্বাধীনতার ভাষাকে দৃঢ় করে।' যদি আমরা আগা শাহিদ আলি, যাকে প্রতিরোধের কবিতার জনক বলা হয়, তাঁর পরবর্তী সময়ে তাকাই, দেখবো কবিতা যেন নিত্যদিনের সংঘাত ও সংশয়ের সাক্ষী। শব্দ উঠে আসছে প্রসব যন্ত্রণার মতো। তরুণ কবিরা অনেকে নিজেকে কারফিউর সন্তান বলে পরিচয় দিচ্ছেন। তরুণ কবি উজমা ফালাক লিখলেন—আমরা নৈঃশব্দকে দেখি, স্মৃতিতে রাখি এবং চুরমার করি। তাই আমাদের লেখার মধ্যে তথ্য বা নির্দিষ্ট পরম্পরা নেই...

...তোমার প্রজন্ম শুধু প্রত্যক্ষ করেছে
মানুষহীন নির্জন অনুশোচনা ও দীর্ঘশ্বাস।

আমাদের অনিশ্চিত জীবনের পূর্বাভাষ
—পৃথিবী শেষ হয়ে যাচ্ছে।
আমাদের পূর্বজন্মের স্মৃতি পেরিয়ে
তুমি সংগ্রাম নিয়ে এসো...
অনুবাদ—সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়

পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী অধ্যাপক সুভির কাউল একটি বই সম্পাদনা করলেন কাশ্মীরি কবিতা নিয়ে ...'গার্ডেনস অ্যান্ড গ্রেভস'। সেখানের কবিতাগুলোতে উঠে এলো জীবনের অনিশ্চয়তা, রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতা ও নিরাপত্তাহীনতার কথা। ১৯৪৭ সালের পরে গুলাম আহমেদ মাহ্জুর এবং দীননাথ নাদিমের কবিতায় আমরা দেখলাম সব ধরণের অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষকে একজোট হবার কথা বলল এঁদের কবিতা। আবার সাহিত্য আকাদেমি প্রাপ্ত কবি নাজি মুনাওয়ার এর কবিতা 'তখন ও এখন' (দেন অ্যাণ্ড টুডে) যদি আমরা পড়ি সেখানে এই প্রতিরোধের ভাষার একটা বিবর্তন আমরা দেখবো।

আলো নিভিয়ে দাও,
কার ওপর তুমি বসে আছো?
নিশ্চই দশটা বেজে গেছে
সারারাত আলোগুলো জ্বলছে,
সারারাত পুড়ছে,
আর কার ওপর তুমি রাগ করে আছো?
তুমি এই অন্ধকার আস্বাদন করো
যে সমস্ত দিনের আলোকে
গোগ্রাসে গিলে ফেলছে...
অনুবাদ— সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়

ক্রমশ কবিতার ভাষায় এলো স্ট্রাইক, কার্ফু, পুলিশ, মিছিল, প্রতিবাদের কথা। কবিরা নিজের ঘর আর বারান্দার মধ্যে আবদ্ধ। অন্য লেখকের বা ভক্তদের সঙ্গে আলাপচারিতার পরিবর্তে এখন শুধু চিৎকার, স্লোগান, টিয়ারগ্যাস আর গুলির আওয়াজে কান পেতে থাকতে হয়। কবিতার সঙ্গীতময়তা বা মূর্চ্ছনা ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে এলো পেশীশক্তি, মেরুকরণের রাজনীতির প্রসঙ্গ। চলচ্চিত্র পরিচালক সঞ্জয় কাক তাঁর একটা লেখায় লিখলেন '...কবিতা কাশ্মীরের মানুষের রক্তে প্রবাহিত হয়। যে যন্ত্রণার কথা তার স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলতে পারে না তা কবিতায় অনায়াসে বলতে পারে।' ২০০৮-২০১০ যে সময় হিংসা গ্রাস করেছিল সমগ্র উপত্যকা অনেক তরুণ কিন্তু অস্ত্রের বদলে তুলে নিয়েছিল কলম। তরুণ কবি উমের ভাট বললেন— 'আমি উন্মাদনাকেই কবিতর আশ্রয় করেছি। নৈঃশব্দ সবসময় আমার পছন্দ নয়। নির্দয় শাসকের উন্মাদনা থেকে কাশ্মীরীদের প্রেম ও স্বাধীনতার উন্মাদনা সবই আমার

বিষয়।' অনেক তরুণকে আমরা দেখেছি পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসর্ডার বা নানা মানসিক অসুস্থতার ভেতরেও কবিতা লিখছেন।

অবরোধ
মূল লেখা-উমের ভাট

রাস্তাগুলো দুর্ভেদ্য ধোঁয়ায় মোড়া,
কাশ্মীর জ্বলছে আবার,
টায়ার জ্বলছে, গাছ জ্বলছে, ঘর জ্বলছে।
আগুনের তরঙ্গ ছুটছে কোথাও,
বাতাসে ধোঁয়ার ফিসফিস,
মাথার ওপর মৃত্যু,
মনখারাপের দেশের
ছোট ছোট ছেলেরা
সরু সরু গলিতে
কালো বেলুনের পেছনে ছুটতে ছুটতে
হারিয়ে গেলো,
ছায়া গুনতে গুনতে হারিয়ে গেলো তারা,
তাদের খাবার নেই, দুধ নেই,
জীবন যেন পাথর হয়ে গেছে,
তার কিছু টুকরো তুলে আনছি
সাংসারিক উৎসবে।
প্রতিদিন রাত্রের খাবার টেবিলে বসে
আমরা পরের সকালের যুদ্ধের প্রস্তুতি নেই।

অনুবাদ—সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়

রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি কবিতা অন্যান্য সামাজিক স্বাধীনতা আন্দোলনের ভাষাও হয়ে উঠছিল। যদিও এর পরম্পরা তৈরী হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। লাল দেদ বা লালেশ্বরী (১৩২০-১৩৯২) কাশ্মীরী নারী কবিদের একটা ঐতিহ্য তৈরী করেছিলেন। তিনি ছিলেন শৈবদর্শনের অনুগামী এক মিস্টিক বা অতীন্দ্রিয়বাদী কবি। এই ধারা বহন করে আধুনিক কাশ্মিরী মহিলা কবিরা তাঁদের কবিতায় নিয়ে এলেন অপমানবোধ, পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রতি প্রশ্ন এবং অভিযোগ। লাল এর শ্বশুরবড়ীর নানা অত্যাচারের কথা যা রূপকের মাধ্যমে আসতো তাঁর কবিতায় সেগুলো আজো কবিদের কলম দৃঢ় করে।

ঠিক তেমনি হাব্বা খাতুনের লেখাতেও আমরা দেখি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সংস্কারের কারাগারে বন্দী মেয়েদের কান্না। অরনিমাল এর জীবন ও কবিতায় দেখলাম স্বামীপরিত্যাগ

ও বিবাহবিচ্ছেদের পর তাঁর মানসিক ও সামাজিক পীড়নের কথাই কবিতা হয়ে উঠেছে। নিঘাত শাহিবা ছিলেন শিক্ষক। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তাঁর মানসিক ও আত্মিক আবেগগুলোকে দমন করলেও সত্যের প্রতি নিষ্ঠা ও অবিচল থাকার মানসিকতার প্রকাশ ছিল তাঁর কাব্যভাষা। কখনো তিনি মৃত্যুকেই তাঁর ত্রাতা ভেবেছেন। নারীদের সমাজ যেন ছিল পুরুষদের তৈরী উপনিবেশ। ছিল হতাশা আর একাকীত্ব। তবু ছিল কোনো এক মানুষের খোঁজ। যে হয়তো মন দিয়ে তাঁর কথা শুনবে, তাঁর সাহচর্য্য উপভোগ করবে। তৈরী হবে একটা প্রেমের নিরাপদ ইতিহাস। দীর্ঘ দিনের শোষণ ও বঞ্চনার ঘেরাটোপ পেরিয়ে হাব্বা খাতুনের কবিতা মেয়েদের ডাক দিল সবার চোখে চোখ রেখে দাঁড়ানোর প্রতিরোধ গড়ে তোলার। লালদেদ যে ধারার জন্ম দিলেন সেটা ছিল অতিন্দ্রীয়বাদী একটা ধারা। আর হাব্বা খাতুন তৈরী করলেন একটা রোম্যান্টিক লোকায়ত কবিতার পথ। লালদেদ লিখলেন...

শিক্ষক আমাকে দিলেন প্রজ্ঞার ভাষা,
বাহির থেকে অন্তরে প্রবাহের অক্ষর,
সেই আমার শেষ সম্বল ছিলো,
লাল এখন উন্মুক্ত প্রান্তরে ঘুরে বেড়ায়।
আমি তাদের কুবাক্য ও থুতুকে মাথার মুকুট করেছি,
জীর্ণ নাছাড়বান্দা কথাকে করেছি পদক্ষেপ,
আমি লাল, আমি ঠিক অবিচল আছি,
শুধু আমার জন্য একটা পুরো ঘর কোথায় পাবো?
তোমার বিশ্বাসের পাথর, তোমার মন্দিরের পাথর,
মাথা থেকে পা পর্যন্ত শুধু পাথর আর পাথর,
হে ব্রাহ্মণ, সত্যি তুমি কার পূজা করো?
তোমার মন ও শ্বাস সব আটকে আছে।

অনুবাদ— সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়

হাব্বা খাতুন ছিলেন ষোলো শতকের মুসলিম পরিবারের মেয়ে। আবার অরনিমাল ছিলেন আধারো শতকের পণ্ডিত পরিবারের কন্যা যখন পাঠানদের শাসন চলছিল। একজনের প্রেক্ষাপটে কোরান, অন্যজনের প্রেক্ষিতে কৃষ্ণ। হাব্বা খাতুন তাঁর নিজের সৌন্দর্য ও প্রকৃতির সঙ্গে বহির্জগতের একটা সম্বন্ধ স্থাপন করতেন। আবার অরনিমাল ছিলে সুপ্ত, অন্তর্মুখী। হাব্বা খাতুনের একটি কবিতা আমরা পড়তে পারি।

আমার শরীরের প্রতিটি ছিদ্রে যন্ত্রণা,
সে তার আকাঙ্ক্ষায় আমাকে ডুবিয়ে দিতো,
সে আমাকে সব দেওয়ালের ওপর দিয়ে দেখতো,
কেনো এতো রাগ ছিল তার?
সব দরজা দিয়ে দেখতো
দরজার ফাঁক দিয়ে.

দেখতো জানলা দিয়ে
আমার বুকে ভরে দিয়েছিলো শূন্যতা,
যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছুই ছিলোনা আমার।
আমাকে ডুবিয়ে দিতা তার আকাঙ্ক্ষা...
অনুবাদ— সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়

কবি ও দার্শনিক মহম্মদ ইকবাল এর 'দ্য গিফট ফ্রম হিজাজ' যদি পড়ি দেখবো খুব সহজ ভাষায় কাশ্মীরের গল্প বলছেন। তাঁর কবিতা পড়লে কাশ্মীরের প্রতিরোধের কবিতার একটা অভিমুখ পাওয়া যায়। ভারতে তিনি বিখ্যাত 'সারে যাঁহা সে আচ্ছা' গানটির লেখক হিসেবে। পাকিস্তানে তিনি শ্রদ্ধেয় আধ্যাত্মিক শিক্ষক। ইকবালের যে রাজনৈতিক দর্শন তা ছিল মুসলিমদের আত্মিক বিবর্তন ও উত্তরণের জন্য নির্দেশিত। তাঁর 'খুদি' বা 'হায়ার সেল্ফ' এর তত্ত্ব কাশ্মীরীদের রাজনৈতিক সচেতনতা, সামাজিক জাগরণ এর সম্বল হয়ে ওঠে। কাশ্মীরের স্কুলের ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীদের কণ্ঠে আমরা শুনেছি তাঁর লেখা গান, 'লব পে আতি হ্যায় দুয়া বনকে তামান্না মেরি।' হিন্দু ডোগরা সাম্রাজ্যের সময়ে কাশ্মীরীদের পাশবিক শোষণ তাঁর রাজনৈতিক ও সাহিত্যের অভিমুখে বদলে দিয়েছিল। ইকবাল কাশ্মীরে আসেন ১৯২১ সালে। রেশম ফ্যাক্টরিতে কর্মরত মুসলিমদের শোচনীয় অবস্থার কথা তিনি লিখলেন তাঁর কবিতা 'সাকি নামা' তে যেখানে তিনি কাশ্মিরী মুসলিমদের রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়ানোর ডাক দিলেন। এই কবিতা লেখার তিন বছর পর কাশ্মীর দেখলো রেশম কর্মীদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ। তার দশ বছর পর ১৯৩১ সালে হিন্দু ডোগরা শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে উঠলেন কাশ্মীরী মুসলিমরা। ১৩ই জুলাই সংঘর্ষে মারা গেলেন বাইশ জন। ইকবাল-এর কাশ্মীরে প্রবেশ নিষিদ্ধ হল। পরবর্তী সময়ে অল ইণ্ডিয়া মুসলিম কনফারেন্সের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে তিনি আবার এই আন্দোলনের ডাক দিলেন।

এভাবেই বিভিন্ন সময়ে কবিতা প্রতিরোধ গড়েছে। প্রতিবাদের ভাষা হয়ে উঠেছে। আসলে যখনই মানুষ তার অস্তিত্বের সংকটে পড়ে তখনই সেই দমবন্ধ অবস্থা থেকে বেরোনোর জন্য সে একটা ভাষা খোঁজে। সেই ভাষা তাকে সব সীমারেখাগুলো টপকাতে শেখায়, কাঁটাতার ভাঙতে শেখায়। এইসব সীমারেখাগুলো আমাদের দেশে, সমাজে, ধর্মে, সংসারে, সম্পর্কে সবক্ষেত্রেই আছে। এগুলো ভাঙতে গেলেই সেটা কোনো প্রথাগত সিস্টেমকে আঘাত করে। সংঘর্ষ শুরু হয়। কবিতার ভাষা যেমন সংঘর্ষের হাতিয়ার, তেমনি সংঘর্ষ থেকেও নতুন কবিতার জন্ম হয়। এ এক অদৃশ্য টানাপোড়েন। আমজাদ ইসলাম আমজাদ লিখলেন

...এইসব পরিত্যক্ত আবর্জনার ছায়ামূর্তি,
এইসব উদ্ধত মরুভূমির বালি,
যেখানে তারা আসবে,
দূর থেকে উপলব্ধি করবে এইসব,
এইসব মাইলস্টোন

আমাদের পথে যারা দূরত্ব নিরূপন করে
তাদের প্রোথিত অবস্থা থেকে মুক্ত করো,
যখন নক্ষত্রের সহৃদয় চাহুনী
আমার ভাগ্যের
অনাথ আকাশকে অদৃশ্য করবে,
আমার অসতর্ক প্রেম,
আমার নিরুদ্দিষ্ট প্রেম
যেখানে তারা থামে, তারা দ্যাখে
আমি জাহাজশহরে উঠি।
যেসব গলিতে হাতড়ে হাতড়ে হাঁটি
আমার আত্মার বাসস্থানে,
যন্ত্রণার আবছা দৃষ্টি প্রত্যক্ষ করি,
সেই সব প্রস্তরীভূত বৃষ্টি
যারা আমার সৌভাগ্য একটা
ভিনগ্রহের আকাশ নির্মাণ করছে।

অনুবাদ— সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়

এখানে আমরা দেখছি সংঘর্ষটা বাইরের জগত থেকে কিভাবে মনোজগতে ঢুকে যাচ্ছে। মানুষের ভেতরে তারই যে নানারকম অস্তিত্ব তাদের মধ্যেই একটা সংঘাত, একটা সংশয়।

আবার অন্যদিকে ফইজ আহমদ ফইজ একটা কবিতা লিখলেন যখন নিরস্ত্র এক প্রতিবাদ মিছিলে পুলিশের গুলি চালানোয় ষোল বছরের এক কিশোর মারা গেলো।

সেইসব কুঁচকে যাওয়া গাছ,
কুঁকড়ে যাওয়া তৃণভূমিকে
সিংহাসনচ্যুত করে শরৎ এলো,
যখন আলো নিষ্প্রভ হয়ে যায়,
দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়
মুহূর্তের রূপোলী আলোয়,
আলো আসে তোমার হাত থেকে,
সেই সব লণ্ঠন থেকে
যারা রাত্রির অন্ধাকরকে পোষ মানায়।
আমার পুড়ে যাওয়া শুকনো ঠোঁট থেকে
সুতো নিয়ে ফাঁসির মঞ্চ তৈরী হলো,
আবার ওরাই যখন রঙ ঢেলে দিলো

বসন্তের ক্যানভাসে
তোমার ঠোঁট ঝলমল করে উঠলো,
তোমার কালো চুলে
বিস্ময় ফুটে ওঠে যখন
তোমার রূপোলী হাতে আলো ঝলসে ওঠে
আর চাঁদ লজ্জায় মুখ লুকোয়
মেঘের আড়ালে।
রাত্রি নেমে আসে অন্ধকার পথে।
আমার শেষ রক্তপ্রবাহ পর্যন্ত
আমি হাঁটতে থাকি,
আমি দাঁড়িয়ে আছি নিশ্চল,
সেই আমি যাকে হত্যা করা হয়েছে
এইসব অন্ধকারপ্রবণ গলিতে।

অনুবাদ—সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়

জন্নুর তরুণ কবি অমিত রামজাই লিখলেন ক্ষীরভবানী ঝরণার জল রঙ বদলেছে। নিচে যেন তৈরী হয়েছে রক্তের স্নানাগার। কাশ্মীরী পণ্ডিত পরিবারে জন্ম নিয়েও অমিত তাঁর কবিতায় কাশ্মীরী পণ্ডিতদের অসহায়তার বিষয়টিকে কোনো হিন্দুর চোখ দিয়ে দেখেননি। তাঁর কবিতার কেন্দ্রে মানুষ। হিন্দু বা মুসলমানের পরিচয়ের খণ্ডিত মানুষ নয়। মানুষকে তিনি মানুষের পরিচয়েই অখণ্ড দেখতে চান। কলমই তার অস্ত্র, ভাষাই তার প্রতিবাদ। তিনি লিখলেন 'আমি অপেক্ষা করে আছি যেদিন ঝরণার জলের রঙ বিবর্ণ হয়ে আসবে।' এভাবেই এগিয়ে এসেছেন সৈয়দ জিশান জয়পুরি। ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্র হলেও তিনি কবিতা লেখার ভাষা নির্বাচন করেছেন উর্দু। সৈয়দ সাদ্দাম গিলানী তাঁর লেখা শুরু করেছেন মুরাদ ছদ্মনামে। এরা সবাই সাম্প্রতিক সময়ের তরুণ কবি। নতুন করে তাঁরা স্বাধীনতার সংজ্ঞা তৈরী করছেন। আসলে মানুষ তাঁদের মতো করে স্বাধীনতা চাপিয়ে দেবার কথা বলে। কেউ বলেন রাজনৈতিক স্বাধীনতা, কেউ বলেন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, আবার কেউ বলেন সামাজিক স্বাধীনতা। একটি অন্যের থেকে পৃথক নয়। কবি যে স্বাধীনতার সন্ধান করেন তা হল মানবিক বা আত্মিক স্বাধীনতা। যেখানে মানুষের অখণ্ড সত্ত্বাকে তিনি স্বীকার করেন। এই স্বাধীনতায় মানুষে-মানুষে, ধর্মে ধর্মে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে কোনো বিভেদ বা বৈষম্য থাকে না। একেই উপনিষদ বলছে 'আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা'। আবার সুফি দর্শনে বলছে 'তাসাউফ'। তাসাউফ ইসলামিক বিশ্বাস বা অনুশীলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিশ্বের সব রকম গহির্ত কাজ থেকে মুক্তি পাবার জন্য শরীয়াহ এই বিশ্বকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। এই স্বাধীনতা মানেই সত্যের অন্বেষণ। সুফি কবি মনুসর আল-হাল্লাজ এর একটি বিখ্যাত উক্তি ছিল 'আনা-আল-হক' বা আমিই সত্য। তিনি লিখেছিলেন

আমিই সে যাকে আমি ভালোবাসি
এবং সেই আমি,
আমরা দুই অস্তিত্ব,
কিন্তু এক শরীর,
তুমি আমাকে দেখলে
তাকেও দেখতে পাবে,
আর তার দিকে তাকালে
দেখবে আমাদের যুগলমূর্তি।

অনুবাদ—সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়

এ যেন এক অদ্বৈতভাবে যেখানে ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পূণ্য, আস্তিক-নাস্তিক, জয়-পরাজয়, জীবন-মৃত্যু সবই একই অস্তিত্বের ভিন্ন প্রকাশ। মানুষ এক-অভিন্ন।

এই লেখা যখন লিখছি বা এই লেখা যখন প্রকাশিত হবে সেই সময় কাশ্মীরে চলছে দুটি ঘটনার প্রভাব, প্রথম ঘটনা হল সংবিধানের ৩৭০-এ ধারার বিলোপ এবং তার পরবর্তী সময়ে দীর্ঘদিন ধরে চলা কার্ফু বা টেলিযোগাযোগ পরিষেবা বন্ধের অবস্থা। দ্বিতীয়টি হল করোনা ভাইরাস অতিমারীর সময় দীর্ঘদিন ধরে চলা লকডাউন। কবি ও চলচ্চিত্র নির্মাতা আশিয়া জাহুর এই ৩৭০ ধারা অবলুপ্তি প্রসঙ্গে একটি কবিতায় লিখলেন 'আমার ইতিহাসের শেকড় গাঁথা আছে কাশ্মীরে, আর কাশ্মীরের ইতিহাসই আমার শেকড়।' 'চিনার' কবিতায় তিনি বললেন এই চিনার গাছ প্রতিটি মানুষের জীবনের ঘটনাপরম্পরার সাক্ষী। চিনার যেন বলছে 'ঋজু দাঁড়িয়ে থাকাই আমার ধর্ম।' তিনি দেখালেন বিভিন্ন সময়ে নানারকম আইনকানুন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে কাশ্মীরের মানুষের ওপরে। ১৮৪৬ সালে অমৃতসর চুক্তির সময়ে কাশ্মীর বিক্রি হয়ে গেছিল। আবার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কাশ্মীরকে বিক্রি করেছিল মহারাজা গুলাব সিং এর কাছে পঁচাত্তর লক্ষ টাকায়। এখনো চলছে সেই হাতবদলের ইতিহাস। তাঁর 'লাইটনেস অব বিইং ইন এ হেভিলি মিলিটারাইসড জোন' কবিতায় তিনি দেখালেন মানুষের অস্তিত্বের একটি প্রকাশ হল প্রবহমান ঘটনার সাক্ষী থাকা। এখন মানুষ দেখছে ৩৭০ ধারার অবলুপ্তি। কিন্তু সত্যি তা কাশ্মীরের মানুষের অধিকার রক্ষা করবে কিনা তা সময় বলবে।

এই রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেই আসে করোনা অতিমারী। দেশজুড়ে লকডাউন। কাশ্মীরের মানুষের কাছে এই ঘরবন্দী থাকাটা নতুন কিছু নয়। কার্ফু, ধর্মঘট, একশো চুয়াল্লিশ ধারা এসবে তাঁরা অভ্যস্ত। দীর্ঘদিন আমার পরিচিত লেখকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। আলি শাইদা, বলরাজ বকসী, শাইল মকবুল কেউ দীর্ঘদিন কোনো চিঠি পাঠাতে পারেননি। দু'বছর আগে আমাদের সংস্থা 'ইসিসার' আয়োজিত 'থিংকারস অ্যাণ্ড রাইটার্স পিস মিট' এ কলকাতায় এসেছিলেন কাশ্মীরের কবি আয়াজ রসুল নাজকি। এই সময় দীর্ঘদিন তাঁর সঙ্গেও যোগাযোগ করা যায়নি। ধীরে ধীরে টেলিযোগাযোগ পরিষেবা স্বাভাবিক হয়েছে। আমরা আবার খবর পাচ্ছি কাশ্মীরের। তাঁর কাছেই পেলাম কাশ্মীরের বিশিষ্ট লেখক আব্দুল রশিদ ফিদা রাজৌরভির মৃত্যু সংবাদ। আবার খবর পেলাম দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাশ্মীরী

কবি ও গবেষক সৈয়দ আলি আকবর শাহ কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্সি ভাষা বিভাগের আলোচনাচক্রে উপস্থিত হয়েছেন পার্সি কবিতা শোনানোর জন্য। ছন্দে ফিরছে কাশ্মীর।

আজ সারা পৃথিবীর মানুষ সন্ত্রস্ত। উঁচু-নিচু, ধনী-দরিদ্র সব মানুষকে এক পংক্তিতে দাঁড় করিয়েছে একটা অনুবীক্ষনিক ভাইরাস। মানুষের তৈরী দখলদারির রাজনীতিতে যে শেষ পর্যন্ত কোনো লাভ হয় না তা দেখছে পুরো পৃথিবী। মানুষের ব্যর্থ অহংকার ও আস্ফালন পৃথিবীর ক্ষতি ছাড়া কোনো লাভ করেনি। এর থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় মানুষের হাত ধরা, তার পাশে দাঁড়ানো। সব ধর্ম, সব দেশ, সব সম্প্রদায়ের মানুষ একজোট হোক। আমাদের একটাই পরিচয় হোক— আমরা এই পৃথিবীর বাসিন্দা। সাম্প্রতিক সময়ে কাশ্মীরী কবি ইনসাহ্ মুজফ্ফর এর একটি কবিতা দিয়ে প্রবন্ধ শেষ করছি।

কাশ্মীরে কারফিউ

এভাবে ঘরবন্দী থাকা আমাদের সয়ে গেছে।
আয়নার দিকে তাকালে নিজেকে
একটা ফাঁসুড়ের মতো দেখায়।
যেখানে আমি জন্মাতে চেয়েছিলাম,
যেখানে লক্ষবার স্বাধীনতা উচ্চারণের কথা ছিল,
সেখানে কোনো ফুল নেই।
পাহাড়চূড়ার পিছনে চন্দ্রগ্রহণের মতো
আর কারোর পুনর্জন্ম হয় না।
কোনো অহেতুক জীবনচক্র নেই কোথাও।
তবু কিছু মানুষ এখনও
একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে
সকালের প্রথম শিশিরের দিকে।
আমি পূর্ণ হই আতঙ্কে, আকাঙ্ক্ষায়।
শব্দের সব অলংকার
এখন কারাগারে রাত কাটায়।
বসন্ত এখানে নিছকই একটা সময়।

অনুবাদ...সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়

বসন্ত ফিরুক কাশ্মীরে। মানুষ তার স্বাধীনতার ভাষা ফিরে পাক।